কাস্তে কবি দিনেশ দাস

কেয়াসেন

সভ্যতার ক্রমবিকাশে প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবর্তন এসেছে নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট রীতিতে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি সাহিত্যেও হয়েছে দাবী মেনেই। সফল সাহিত্যিক কখনোই সময়ের দাবীকে অস্বীকার করতে পারেননি। একজন সংবেদনশীল কবির মনে যুগযন্ত্রণা কতটা প্রভাব ফেলতে পারে তা আমরা তাঁর লেখার মধ্যেই দেখতে পাই। দিনেশ দাস এমনই একজন কবি যিনি তাঁর হৃদয়ের অনুরণনকে ব্যক্তি উপলব্ধির মধ্যে না রেখে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন কবিতার ছত্রে ছত্রে। এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে দিনেশ দাস কবিতা লেখা শুরু করেন। বিশ্ব রাজনীতিও জাতীয় রাজনীতির টালমাটাল পরিস্থিতি সামাজিক মানুষকে প্রতিনিয়ত যন্ত্রণায় বিদ্ধ করছিল। এই যন্ত্রণার সঙ্গে কবি দিনেশ দাস নিজেকে একাত্ম করে প্রমাণ করলেন তিনি প্রকৃতই দিন এবং দীনের কবি। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে দিনেশ দাস কবিতা লেখায় আশ্রয় নিতেন। নাম যশ খ্যাতি তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তাঁর মন্তব্য - ''আমি কবিতা থেকে নাম যশ কিছুই চাই না।'' কবিতা ও জীবনকে কখনো আলাদা ভাবেননি দিনেশ দাস।

১৯১৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর কলকাতার আলিপুরের এক স্বচ্ছল পরিবারে দিনেশ দাসের জন্ম। বাবার নাম হৃষীকেশ দাস, মায়ের নাম কাত্যায়নী দেবী। কবির পিতামহ ও পিতা দুজনেই ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী। পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে স্বাধীনতার স্পৃহা তাঁকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করেছে। তাই কৈশোরেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। এই সংগ্রামী ও বস্তুবাদী চেতনা পরবর্তীকালে তাঁকে যথার্থ কবি হতে সাহায্য করেছে। ১৯৩০ সালে চেতলা বয়েজ স্কুল থেকে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পড়াশুনায় মনোযোগী হওয়া সত্ত্বেও পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার অদম্য বাসনায় ঐ বছরই (১৯৩০ সালে) গান্ধীজির সঙ্গে লবন আইন অমান্য অন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩১ সালে গান্ধী - আরউইন চুক্তি এই আন্দোলনে কিছুটা স্থিতাবস্থা আনে। তবে পরাধীনতার গ্লানি মোছাতে সক্ষম হয়নি। ১৯৩২ সালে দিনেশ দাস আশুতোষ কলেজ থেকে আই.এ.পাস করে স্কটিশ চার্চ কলেজে বি.এ.তে ভর্তি হন। স্কুলে ছড়া মেলানোয় অভ্যস্ত দিনেশ দাস এই সময় কলকাতার সাহিত্য চর্চায় কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠেন। সাপ্তাহিক 'দেশ' ও সজনী কান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় কবিতা ছাপা হতে শুরু করে ১৯৩৪ সালের মধ্যে। ফলে তিনি কবি হিসেবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। সাহিত্যিক হিসেবে সচেতন ভাবে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়ার তাগিদ অনুভব করলেন। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক কৈলাস বসুর কাছে ফরাসী ও জার্মান ভাষাও শিখেছিলেন।

ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের প্রতিবাদে দিনেশ দাস শিক্ষান্তে সরকারী চাকরি গ্রহণ না করে ১৯৩৫ সালে কার্শিয়াং অঞ্চলে একটি বেসরকারী চা বাগানে চাকরিতে যোগ দেন। 'ঘরবাড়ি -চা বাগান' এর ম্যানেজারের ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষকতা করার সময় তিনি একটি চাকরি পান। তবে এ চাকরিতে তিনি বেশিদিন নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারলেন না। চা বাগানে কর্মরত কুলিদের ওপর মালিকদের অবর্ণনীয় অত্যাচার নিপীড়ন সংবেদনশীল দিনেশ দাসকে গভীর ভাবে মর্মাহত করল। গান্ধীবাদী দিনেশ দাসের মনে অহিংস নীতির প্রতি সংশয় দেখা দিল। তাঁর নিজের কথায় ''একদিকে হিমালয়ের ধ্যান গম্ভীর পার্বত্য প্রকৃতি আমার অস্থির প্রকৃতিকে শান্ত সমাহিত করল, অন্যদিকে চা-বাগানের নিপীড়িত কুলিদের দুর্দশা আমার মনকে গান্ধীবাদের প্রতি সংশয়িত করে তুলল।'' (ভূমিকা, দিনেশ দাসের কাব্য সমগ্র, মনীষা, ১৯৮৪) এই ঘটনায় তাঁর জীবনবোধে পরিবর্তন আসে। কবি রোমান্টিকতার খোলস ত্যাগ করে হয়ে ওঠেন বাস্তববাদী।

১৯৩৬ সালে চা-বাগানের কাজ ছেড়ে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। তখন বাংলা কবিতার জগতে নতুন যুগের হাওয়ায় নবীন প্রাণের সঞ্চার ঘটে। 'পরিচয়', 'পূর্ব্বাশা', 'কবিতা' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কবিরা প্রেরণা পেতে থাকেন। গদ্যরীতিতে কবিতা লেখা কবিদের কলমে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। দিনেশ দাসও সহজেই মিশে গেলেন এই ধারার সঙ্গে। ১৯৩৬ সালেই আশু চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অগ্রগতি' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। শুরু হয় নিয়মিত কবিতা চর্চা। দিনেশ দাসের প্রথম গদ্য কবিতা 'প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা' 'অগ্রগতি' পত্রিকাতেই ছাপা হয়। এছাড়াও দিনেশ দাস 'নিরুক্ত' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। ১৯৩৬ সাল দিনেশ দাসের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। ঐ বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত প্রথম বাংলা কাব্যের সুবিখ্যাত সংকলন 'বাঙলা কাব্য পরিচয়' -এ কবির লেখা 'মৌমাছি' কবিতাটি সংকলিত হয়। যা স্টেটসম্যান পত্রিকাতেও অনূদিত হয। এ সময় মার্ক্সীয় দর্শন কবিদের মানসভূমিকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। দিনেশ দাসও এর থেকে দূরে সরে থাকতে পারেন নি। তিনি এই দর্শনে দীক্ষিত একজন কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত হলেন। কবির নিজের স্বীকারোক্তি— ''১৯৩৬-এ চা বাগান থেকে ফিরে এসে একটি নতুন মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হলুম যার নাম 'কমিউনিজম্'। এর মতবাদটির ওপর ব্রিটিশ সরকারের খুব আতঙ্ক এবং পুলিশের কড়া নজর। অথচ তাদের চোখে ধুলো দিয়ে খিদিরপুর ডক্ এলাকায় আমদানী হত বিদেশী জাহাজ করে সাম্যবাদী গ্রন্থ ও পত্রিকা। 'আলিপুরে রেডগার্ড' আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে তখন। কমরেড রনেন সেন ও অন্যান্য নেতৃবর্গের সহায়তায় আমার পরিচয় ঘটল মার্কস, এঙ্গেলস্, র‍্যাফল ফক্স প্রভৃতি সাম্যবাদী মনীষীদের গ্রন্থের সঙ্গে। আমার কাব্যের হাওয়া বদল হল। রোমান্টিসিজমের ডুবজল থেকে ধীরে ধীরে সাম্যবাদের বাস্তব ডাঙায় উঠে এলাম।'' (দিনেশ দাসের কাব্য সমগ্র, ভূমিকা, মনীষা প্রকাশনী, ১৯৮৪)

একদিকে স্বচক্ষে দেখা চা-বাগানে কুলিদের ওপর নির্মম শোষণ অন্যদিকে মার্কর্সবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এই দুইয়ের সংস্পর্শে ১৯৩৭ সালে কবি লিখলেন কালজয়ী সেই কবিতা 'কাস্তে', যা কবিকে সর্বভারতীয় খ্যাতি এনে দেয়। সারাদেশের মানুষ অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানান কবিকে। অনুজ কবি কৃষ্ণ ধরের মতে 'এই একটি মাত্র কবিতা লিখেই যদি তিনি কলম বন্ধ করতেন তাহলেও বাংলার মানুষ মনে রাখত এই অসামান্য কবিকে।' কবিতাটি রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা বলে রাজরোষের কারণে প্রায় এক বছর কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এমন কি অগ্রগতিতেও না এটা কবির কাছে গভীর আঘাত হেনেছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন এই কবিতা প্রকাশিত না হলে তিনি আর কলম ধরবেন না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা আর পূরণ হয় নি। ১৯৩৮ সালে কবি অরুণ মিত্রের সৌজন্যে শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় কবিতাটি প্রকাশ পায়। প্রকাশমাত্রই কবিতাটি সাহিত্যিক মহলে কতটা আলোড়ন ফেলে তার কিছুটা আঁচ আমরা পেতে পারি। ১৯৩৯ সালে অগ্রজ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে 'কাস্তে' কবিতার কিংবদন্তী পংক্তি 'এ -যুগের চাঁদ হল কাস্তে' শিরোনাম রূপে ব্যবহার করে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় দুটি কবিতা লেখেন। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সুখেন সেন প্রমুখ নবীন কবিরাও শিরোনামে বিভিন্ন পত্রিকায় এছাড়া এই 'কাস্তে'র, দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আরও দশটি গল্প ও কবিতা লেখা হয়।

দিনেশ দাসের 'কাস্তে' কবিতাকে কোন লেখক বা কবিই অতিক্রম করতে পারেনি। তাঁর এই কবিতা হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক

চেতনা, সংগ্রামী প্রতিরোধ ও দায়িত্ববান মার্ক্সীয় কবির অনন্য প্রকাশ। মুসোলিনী ইথিওপিয়াকে বোমা বিধ্বস্ত করে গোটা বিশ্বের মহাযুদ্ধের যে আতঙ্ক তৈরী করেছিলেন তারই প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে এই কবিতাটি। জার্মান - ফ্যাসিস্টদের বেয়নেট যতই ধারালো হোক না কেন জনগনের শক্তির কাছে তা অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে কবির। কৃষক ও শ্রমিকরে মুক্তির মন্ত্র আছে 'কাস্তে' কবিতায়—

''বেয়নেট হোক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিয়ো বন্ধু!
শেল আর বোম্ হোক ভারালো
কাস্তেটা শান দিয়ো বন্ধু!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক মুহূর্তে ভেঙে পড়া মূল্যবোধ দেখে দিনেশ দাস হতাশায় ভেঙে না পড়ে খেটে খাওয়া কৃষকের পাশে দাঁড়িয়ে কাস্তে শানিয়ে শ্রমজীবী মানুষের হাতে নতুন পৃথিবী গড়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছেন। চাঁদ হল রোমান্টিক ভাবের অন্যতম প্রতীক। অন্যদিকে কাস্তে হল ভারতবর্ষের সমগ্রসাধারণ মানুষের কাছে বেঁচে থাকার একমাত্র প্রতীক। দিনেশ দাস সমসাময়িক কালের পরিস্থিতির বিচারে জনগণকে স্বপ্নের জগতে বিচরণ না করে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে বলেছেন—

''নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ-যুগের চাঁদ হল কাস্তে!''

জীবনবোধের সততায় 'কাস্তে'কবিতাটি দিনেশ দাসের মার্ক্সীয় রাজনৈতিক চেতনার অন্যতম প্রকাশ। তিনি গণমানুষের চেতনা বিকাশ ঘটানোর জন্য পরবর্তীকালে 'কাস্তে' নামে একটি স্বতন্ত্র কাব্য সংকলন প্রকাশ করেন যা ১৯৭৫ সালের ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৩০ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে নভেম্বর বিপ্লব দিবসে নামে উৎসর্গ করেন।

১৯৩৮ সালে দিনেশ দাস আশুতোষ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। এই সময় সাম্যবাদ কবির জীবনের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। জানাজানি হওয়ার ফলে কবির বাড়িতে তল্লাসী চলে। এর কিছুদিন আগেই 'কাস্তে' কবিতাটি প্রকাশ পেয়েছে। আরও কিছু সাম্যবাদী কবিতা লেখা হয়। যা তখনও প্রকাশ পায়নি। কিছু নিষিদ্ধ সাম্যবাদী গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে কবিকে ১৯৩৯ এ ইলিসিয়াম রোডে (বর্তমানে লর্ড সিন্‌হা রোড) স্পেশাল ব্রাঞ্চের দপ্তরে আটক থাকতে হয় কিছুদিন। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হয়। কলকাতার আকাশে বাতাসে বোমার আতঙ্ক। কমিউনিস্ট পার্টির ওপর চাপানো নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহৃত হয়। ১৯৪১ সালে 'পূর্ব্বাশা' প্রকাশনী থেকে কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সহায়তায় প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাঃ ১৩৪৩ - ৪৮' প্রকাশ পায়। নানা পত্রিকায় গ্রন্থটি অকৃপণ প্রশংসা লাভ করে। ১৯৯৯-৩৪ এর মধ্যে লেখা কবিতা এবং ১৯৩৭-৪১ এর মধ্যে লেখা প্রগতিমনস্ক কবিতার অধিকাংশ পাওয়া যাবে এই সংকলনে। তবে এই কাব্যগ্রন্থের প্রথমদিকের কবিতাগুলিতে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও রোমান্টিকতার ছোঁওয়া পাওয়া যায়। শরীরী প্রেমের প্রকাশ রয়েছে এই কবিতায়। 'সবুজদ্বীপ' কবিতাটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—

''আমি যদি হই ঢেউয়ের মতই
চুপে চুপে ভেঙে যেতাম তোমার দেহে
অস্ফুট গুঞ্জনে
সারাদিন সারারাত
আর তুমি যদি নির্জন সবুজ দ্বীপ হতে।''

'হাই' বা 'প্রথম চুম্বনে'র মত কবিতাতেও দিনেশ দাস শরীরী প্রেম ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন। তবে কল্লোলের কবিদের মত দেহসর্বস্ব প্রেমে দিনেশ দাস বিশ্বাসী ছিলেন না।

''গোধূলি লগ্নে তোমার প্রথম চুম্বনই আমার প্রকৃত পরিণয়
সাক্ষী হল আকাশের গ্রহ তাঁরা চাঁদ নক্ষত্র'' (প্রথম চুম্বন)

কবিরা সবসময় সৌন্দর্য সাধক হন। দিনেশ দাসও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি মৌমাছিকে দিয়ে জানতে চেয়েছেন বুঝতে চেয়েছেন সুন্দরকে—

''কেমন সুন্দর ওই উড়ন্ত মৌমাছি!
অশ্রান্ত করুণ ও গুণগুনোনিতে
কেঁপে ওঠে মাটির মসৃণতম গান,''

এখানে প্রকৃতির প্রতি কবির অনুরাগের ছবি ভেসে ওঠে। প্রথম জীবনের এই কাব্যগ্রন্থে নারী ও প্রকৃতির প্রতি যেমন বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। তাই তো এই সময়ে 'কাস্তে'র মত রাজনীতি সচেতন, 'ব্যাঙ্ক' -এর মত পুঁজিবাদ বিরোধী মানসিকতা এবং 'গোলামখানা'র মত স্বৈরাচারে প্রতি ঘৃণা প্রকাশ রয়েছে। এ ধরনের কবিতাও লিখেছেন দিনেশ দাস—

''আমরা আছি, তাই তো চাকা চলছে,
স্বৈরাচারের তাই তো চুলি জ্বলছে,
আমরা যেন সলতে
আমরা শুধু জ্বলতে জানি, জানি কেবল গলতে।''।

সদ্য মার্ক্সবাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটার সুবাদে দিনেশ দাসও স্বপ্ন দেখতেন নতুন পৃথিবীর, যেখানে থাকবে না কোন অত্যাচার শোষণ পীড়ন, অথ'নৈতিক ভেদাভেদ। 'আগামী' (১৯৩৮) কবিতায় তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

''স্থাপিত নিয়মতন্ত্র কোথা যেন হয়েছে বিকল
অচঞ্চল ছিল যাহা আজ তাহা হয়েছে চঞ্চল,
স্থির আজ হয়েছে অস্থির,
পুরানো পৃথিবী তাই স্বপ্ন দেখে নতুন পৃথ্বীর
তাইতো নামিবে ভোর
পৃথিবীর ভস্মশেষ স্তুপের ওপর, এবার নামিবে ভোর নতুন সকাল

জানি জানি ভোর হবে কাল।"

দিনেশ দাস নিজেকে সময় এবং সমাজ সচেতেন কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর কবিতায় মানবিকতাবোধের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সমাজের বেদনাপীড়িত মানুষের কথা তিনি তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন। ১৯৪৪ সালে চিত্রনাট্যকার বন্ধু জ্যোর্তিময় রায়ের চেষ্টায় 'বুক এম্পোরিয়ম' থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ভুখ - মিছিল' এর প্রায় সব কবিতাতেই দিনেশ দাসের সমাজ সচেতনতার গভীরতার দিকটি ফুটে উঠেছে। রাজনীতি সচেতনতা দিনেশ দাসকে সমসাময়িক অস্থির অবস্থা ও তার পরিণতি সম্পকে' আলোড়িত করেছিলো। তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাঁর কবিতায়। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে শুরু হয় দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের কবিতা। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সম্মুখীন। জাপানী বোমার আতঙ্ক মন্বন্তর - এর হাহাকার সব মিলিয়ে সাঁড়াশি আক্রমণের মত অবস্থায় মানুষ কতটা অসহায়, কতটা যন্ত্রণায় বিদ্ধ তা একজন হৃদয়বান বিবেকবান কবিকে স্পর্শ করবেই। এইসব মানুষের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে লিখলেন 'গ্লানি ১৩৫০'—

''বেঁচে আছি আমি
এর চেয়ে নেই লজ্জা নেই বড় গ্লানি
আমার চতুর্দিকে রাত্রিদিন হাহাকার
মৃত মাঝে প্রাণের কলঙ্ক নিয়ে ব'হে চলি আদিম শরীর
বেঁচে আছি আমি।
এর চেয়ে নেই লজ্জা নেই বড় গ্লানি।"

১৩৫০ -এর মন্বন্তরে কবি বেদনাহত। একটু ফ্যানের জন্য হাহাকার, বেঁচে থাকার জন্য মানুষ মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে কিভাবে শেষ লড়াই করে গেছে তা আমরা সমসাময়িক অনেক কবি সাহিত্যিকদের মত দিনেশ দাসের রচনাতেও দেখতে পাই। তাঁর 'ডাস্টবিন' কবিতায় উল্লেখ করেছেন—

''মানুষ এবং কুত্তাতে
আজ সকালে অন্ন চাটি এক সাথে
আজকে মহা দুর্দিনে
আমরা বৃথা খাদ্য খুঁজি ডাস্টবিনে।"

ডাস্টবিনে মানুষের বৃথা খাদ্য খোঁজার যন্ত্রণাকে কবি যেমন উপলব্ধি করেছেন তেমনি অনুধাবন করেছেন এই অবস্থার জন্য প্রকৃতি আংশিক দায়ী হলেও আসল দায়ী কিন্তু মানুষ এবং আমাদের সভ্যতা—

''এই যে খুনে সভ্যতা
অনেক জনের অন্ন মেরে কয়েক জনের ভব্যতা
এগোয় নাকো পেছোয় নাকো অচল গতি ত্রিশঙ্কুর
হোটেলখানার পাশেই এরা বানিয়ে চলে আঁস্তাকুড়।"

বনিক, প্রভু, মজুতদার, শোষকশ্রেণী এরা সকলে তাদের মুনাফা বাড়ানোর লক্ষ্যে অমানবিকভাবে স্বৈরাচারী হয়ে যে ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে দিনেশ দাস তার অবসান চান। তাই তিনি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পেরেছেন—

''তোমায় শেষে আসতে হবে তোমার গড়া ডাস্টবিনে।"

'ভুখামিছিল' কাব্যগ্রন্থের 'নাম' কবিতায় দিনেশ দাস যুদ্ধপরবর্তী পরিস্থিতির ছবি এঁকেছেন—

''এই আকাশ স্তব্ধনীল,
কোনখানেই
যুদ্ধ নেই
হেথা আকাশ রুক্ষনীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখমিছিল।"

সাম্যবাদী চেতনায় দীক্ষিত কবি দিনেশ দাস নিজেও যেমন স্বপ্ন দেখতেন তেমনি ভেঙে পড়া মননকে দৃঢ়তা দানে তিনি ছিলেন অগ্রণী। সাম্যবাদের কাছে তিনি শিখেছিলেন প্রতিকূল পরিস্থিতির কাছে হার না মেনে তাকে জয় করেই এগিয়ে যেতে হয়। এই কাব্যগ্রন্থের 'বামপন্থী' কবিতায় দিনেশ দাস সরাসরি বলেছেন বামপন্থা তথা মার্ক্সবাদের কাছে সমর্পণের কথা-

'দক্ষিণ পথে মেলে যদি দক্ষিণা
ভেবে দেখো তবু সেই পথ ঠিক কিনা,
বন্ধু তোমার পথ নয় দক্ষিণে
বামপথ নিও চিনে।"

নিজস্ব মত ও পথ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে মুক্ত কণ্ঠে এ কথা কবি বলেছেন। পাশাপাশি সাধারণ বঞ্চিত মানুষকে দিশার সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

১৯৫১ সালে তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'দিনেশ দাসের কবিতা (সংকলন)' নামে প্রকাশ পায়। এর মধ্যে কবির জীবনে ঘটে গেছে কতগুলি ঘটনা। ১৯৪৬ -এ তাঁর কর্মজীবনে তিনি পুঁজিবাদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে গেলেন ব্যাঙ্ক ও বীমা কর্মীদের একটি ইউনিয়ন গঠনের মধ্য দিয়ে। তিনি চাকরি ছেড়ে যোগ দেন দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার বার্তা বিভাগে। ঘুমকাতুরে স্বভাবের জন্য তিনি এই চাকরিও ছেড়ে দেন। 'মাতৃভূমি' নামে একটি মাসিক পত্রের সহযোগী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিন আবার চলচ্চিত্রে গীতিকার ও সহকারী পরিচালক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু একাজেও তিনি বেশিদিন মনোনিবেশ করতে পারেন নি। ১৯৪৬ সালে নৌবিদ্রোহ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কবির মনে দাগ ফেলেছিলো। অবশেষে ১৯৪৭ -এ স্বাধীনতা এলেও তা ছিল দ্বি-খন্ডিত। যা প্রতিটি ভারতীয়র মত কবিকেও ব্যথিত করেছিল। ১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর মত্যু কবিকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিলো। তিনি বুঝেছিলেন হিংসা - বিদ্বেষ - লালসা এসব সমাজকে কেবল কলুষিতই করে না দাঙ্গা সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপনে সমাজের মূল্যবোধকে ভেঙে তছনছ করে দেয় এবং মানবিকতা ও মূল্যবোধের অপমৃত্যু ঘটায়। তাই অহিংসার নায়ক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে তিনি লিখলেন 'শেষ ক্ষমা', 'স্বর্ণভস্ম', 'পুনর্জন্ম' নামে কিছু কবিতা যেখানে গান্ধীজীকে শ্রদ্ধায় স্মরণ আছে—

''ভস্মন তোমার ছড়িয়ে দিলাম
গঙ্গা সিন্ধু খর স্রোতে,
নীল, অ্যামাজন, হোয়াংহোতে
ছড়িয়ে দিলেম, জড়িয়ে দিলেম
সাতসাগরের অতল জলের অন্ধকারে,
নতুন প্রাণের অঙ্গীকার।''

পরবর্তীকালে দিনেশ দাস কিছুটা অভিমান কিছুটা ক্ষোভ নিয়ে চলে যান হাওড়া জেলার 'দেউলপুর' গ্রামে একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে। গ্রাম বাংলার শান্ত শ্যামল প্রকৃতি কবির মনের ওপর প্রভাব ফেলে। কবির মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতারও যেন কিছুটা দিকপরিবর্তন ঘটল। এই পর্বের কবিতার সমষ্টি নিয়ে ১৯৫৪ সালে 'অহল্যা' নামে আরেকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায়। বন্ধু শ্রী চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে দিনেশ দাস নিজেই তা প্রকাশ করেন। কবির মানসিক পরিবর্তনের স্পর্শ পাওয়া যায় ' বৃষ্টি পড়ে', 'ঘুঘু ডাকে', 'ভারতবর্ষ প্রভৃতি কবিতায়। দিনেশ দাসের কাব্যজীবনে প্রকৃতির প্রভাব ছিল অপরিসীম। কবিজীবনের শুরুতে প্রকৃতির যে মায়াঞ্জন তিনি পেয়েছিলেন তার রং তখনো লেগেছিল তাঁর চোখে। গ্রামে গিয়ে তিনি নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করলেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে। 'ঘুঘু ডাকে' কবিতায় তার প্রতিফলন রয়েছে—

''আমার শরীর - মন
রেষারেশি করে নাকো পুরোনো বিরোধে
হাত ধরাধরি করে
নেমে আসে সকালের ভোর কচি কলাপাতা রোদে।''

মানুষের খুব কাছাকাছি থাকার ফলে দৈনন্দিন জীবনে চারপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি কবিমনকে স্পর্শ করত। যথার্থ প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন বলেই পৃথিবীর মূল্যবোধের বিনষ্টি তাঁকে যন্ত্রণায় যত বিদ্ধ করেছে ততই তিনি হয়ে উঠেছেন মানব প্রেমিক। প্রকৃতি ও মানুষ একই সূত্রে গাঁথা এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সভ্যতার ইতিহাসে এরা একে অপরের পরিপূরক। প্রকৃতি মগ্নতার সাথে সাথেই শ্রমজীবী মানুষের জয়গানও গেয়েছেন। বঞ্চিত মানুষের জন্য মানবাত্মার বেদনাকে তিনি রূপায়িত করেছেনে তাঁর প্রখর দীপ্ত সহমর্মিতায়—

''জীবন বিশাল স্মরণীয়,
প্রাণের গোপন কূপে অনন্ত পানীয়,
তবু চাপা পাষাণের অতলে পাষাণ
অহল্যার মত কাঁদে শিলীভূত প্রাণ।'' ('অহল্যা'/ 'অহল্যা')

এখানে যে স্মরণীয় জীবনের কথা দিনেশ দাস বলেছেন তা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় । এ কবিতা পড়ে কবি জীবনানন্দ দাস দিনেশ দাসকে চিঠি লিখেছিলেন - ''অহল্যাকে আপনি আধুনিক যুগের সনাতন পৃথিবীর মানবের ব্যথিত শিলীভূত প্রাণের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে যে চেতনার পরিচয় দিয়েছেন তা অপূর্ব।'' এছাড়া ড. নীহার রঞ্জন রায় এবং সুধীন্দ্র দত্ত 'অহল্যা' কবিতা পড়ে তাদের মুগ্ধতার কথা স্বীকার করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতায় দেখা যায় প্রতীকের সাহায্যে অনুভূতিকে চেতনার স্তরে আনার চেষ্টা করেছেন কবি। 'নীল জল', 'ভাঙা গাছ', 'সাদা অন্ধকার' প্রভৃতি কবিতায় তার ছাপ রয়েছে। দিনেশ দাস রোমান্টিকতার স্তর অতিক্রম করে কখনো প্রতীকী কখনো বা অতিবাস্তবতার স্তরে এসে পৌঁছেছেন। এই সময় তিনি দেউলপুর ছেড়ে চেতলা উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলার শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে যে শিক্ষক আন্দোলন হয়েছিল দিনেশ দাস তাতে যোগদান করেন। সেই অভিজ্ঞতা রয়েছে 'শিক্ষক আন্দোলন ১৯৫৪' কবিতাতে। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে লেখা 'প্রণমি' কবিতাটি বিশেষ উল্লেখ্য। এই কবিতাটি আমাদের হৃদয়কে ভেতর ও বাইরের সঙ্গে সমন্বয় ঘটাতে সাহায্য করে। 'কাস্তে' কবিতার মত এই কবিতার কয়েকটি পংক্তি তখন সহৃদয় পাঠকের মুখে ঘুরত—

''আকাশে বরুণে দৃঢ় স্ফটিক ফেনায়
ছড়ানো তোমার প্রিয় নাম,
তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা
কোন্‌খানে রাখব প্রণাম।''

দিনেশ দাস মানুষের দুঃখে কেঁদেছেন। কাঁদাতে চেষ্টা করেছেন সচেতন হৃদয়বান মানুষদের যারা মানুষের যন্ত্রণার কারণ উপলব্ধি করতে পারবেন।

''অহল্যার কান্না শুনি জীবন্ত পাথরে
স্ফটিক শিশিরে উজ্জ্বল
কোথায় হলুদ শিষ, আশা, শান্তি জল ('অহল্যা'/ 'অহল্যা')

এই কান্নার মধ্যেও দিনেশ দাস ''আকাশের ধ্রুবতারার মত স্থির'' করে রেখেছেন আশাকে যা একজন মার্ক্সবাদী কবিই পারেন।

সারাজীবন ধরে দিনেশ দাস মানুষের মঙ্গল সাধনের চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। যেখানে অন্যায়, মনুষ্যত্বের অপমান সেখানেই তাঁর লেখনী গর্জে উঠেছে। শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ গঠনের যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে কবিতার জগতে তাঁর প্রবেশ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার বাস্তব রূপায়ণে তিনি ছিলেন সচেষ্ট। হয়তো কখনো কখনো তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়েছেন কিন্তু তা অচিরেই কাটিয়ে উঠে মানবমুক্তির যে মন্ত্রে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন সেই মন্ত্রসাধনায় নিমগ্ন থেকেছেন। শারীরিক দিক থেকে ১৯৬১ সাল থেকে তিনি ব্লাড প্রেসার ও আর্থারাইটিসে প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর লেখনী থেমে যায়নি। ১৯৬৪ সালে কানাইলাল সরকার 'ত্রিবেণী' প্রকাশন থেকে 'কাঁচের মানুষ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের 'কাব্য চিন্তা' কবিতায় তিনি লিখেছেন কবিরা মানুষের প্রতি ভালোবাসায় কবিতা লেখেন অর্থাৎ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন—

''কবিরা কবিতা লিখে
সম্মানের করে না প্রত্যাশা।
কবিতা কবির শুধু আনন্দের অভিব্যক্তি—
মানুষের প্রতি ভালবাসা।''

এই কাব্যগ্রন্থের 'শ্রীমতী' কবিতাতে দেহাতীত প্রেমের কথা বলা হয়েছে। প্রথমে শরীরী প্রেমে বিশ্বাসী হলেও পরবর্তী'কালে দেহাতীত প্রেমের প্রতিই দিনেশ দাশ বেশি আগ্রহ দেখান—

''তুমি তার দেহ ছোঁও
সে তো ছোঁয় তোমার হৃদয়?
অতল অথই
হৃদয়ের হ্রদ তার ছুঁতে পার কই?''

এভাবে দিনেশ দাসের প্রেম চেতনার পূর্ণতা ঘটেছে। রোমান্টিক ভাবালুতা বা স্বপ্নভিসারে নয় যে প্রেম দেহ ছাড়িয়ে অন্য এক জগতে নিয়ে যায় আমাদের।

১৯৭২ সালে দে'জ পাবলিশিং -এর পক্ষ থেকে দিনেশ দাসের 'অসংগতি' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায়। এই কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় দিনেশ দাস তাঁর কাব্যভাবনা সম্পর্কে লিখেছেন— ''কবিতা প্রধানত দু'জাতের। একধরনের কবিতা লেখা হয় রুদ্ধ দ্বার ঘরে, যেমন মালার্মের রচনা, আর একদল কবি আছেন যেমন নেরুদা, আরাগাঁ, যাঁরা ঘরের দরজা - জানলা খোলা রাখেন - কখনও বা মুক্তদ্বার দিয়ে বাইরে এসে আবিষ্কার করেন মানুষ ও পৃথিবীকে। আমাকেও ঘর ছেড়ে জাতীয় আন্দোলনে নামতে হয়েছিল। পরাধীনতার বেদনা এবং দেশবাসীর দারিদ্র্য ও দুর্দশার সঙ্গে একাত্মতাই এর মূল কারণ। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমার কবিতার মূল সুর হয়েছে মানবিকতা বোধ।'' প্রথম জীবনে দিনেশ দাস মালার্মের সহযাত্রী ছিলেন ঠিকই কিন্তু কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতায় নেরুদা, আরাগাঁর দৃষ্টিভঙ্গীই অনুসরণ করেন। কবির মূল সুর হল মানবতাবাদ। তিনি হয়ে উঠলেন সংবেদনশীল। তিনি যেমন কৃষক, শ্রমিকদের বঞ্চনার কথা বলতে চেয়েছেন তেমনি তাদের দু-চোখে আঁকতে চেয়েছেন ভবিষ্যত জীবনের প্রসারিত আরো উজ্জ্বল সুখ স্বপ্ন। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতা 'লেনিন শতবর্ষে কোন চাষী' কবিতায় তার স্বাক্ষর পাওয়া যায়—

''লেনিন তোমার আগুন - স্বপ্ন সাপ হয়ে ফণা তোলে,
ছোবলাবে মাটি কখন অকস্মাৎ,
পরগাছা গুলো বিষে বিষে হবে নীল
শেষ হবে এই দুঃস্বপনের রাত।
কেটে যাবে এই অমাবস্যার ঘোর,
কাকের মুখেতে বটফল যেন টকটকে রাঙা ভোর।''

মেহনতী সর্বহারা মানুষদের দিনেশ দাস সব সময় প্রেরণা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাদের আন্দোলনে তিনি সামিল হয়েছেন সচেতন ভাবে। তাঁর 'গান, শ্লোগান, মেসিনগান' কবিতায় তিনি বলেছেন—

আমি কবি চিরদিনই সর্বহারা
আমার পিছনে সারাজীবন ধরে ঘোরে
ক্ষুধার বীভৎস নেকড়েগুলো।''

বোঝা যাচ্ছে জীবন যন্ত্রণা প্রকাশে কবি সফল। কাব্যের শৌখিন মজদুরী তাঁর পছন্দ নয়। শিল্পের জন্য শিল্প নয়, মানুষের জন্যই শিল্প — এ তত্ত্বে দিনেশ দাস ছিলেন আজীবন অবিচল।

১৯৭৫ সালে দিনেশ দাসের আরেক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'কাস্তে' প্রকাশ পায়। এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পেছনে দিনেশ দাস নিজেই বলেছেন যে ১৯৭৪ সালে আসানসোলে কবি সম্মেলনে 'কাস্তে', 'ডাস্টবিন' প্রভৃতি কবিতা পাঠের সময় নানান বয়সী কাব্যামোদীদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে কবি 'কাস্তে' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের তাগিদ অনুভব করেন। ৩৬ বছর আগে যেটা প্রকাশের প্রয়োজন ছিল বলে কবির মনে হয়েছে। কবিপুত্র শান্তনু দাস নিজের 'গঙ্গোত্রী প্রকাশনী' থেকে প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। এক বছরের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ দে'জ পাবলিশিং দায়িত্ব নেয় প্রকাশ করার।

দিনেশ দাসের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'রাম গেছে বনবাসে' প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত লেখা কবিতা এই কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৮২ সালে কবি রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হন। পশ্চিমবঙ্গের অস্থির সময়ের ছবি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কলমে ফুঠে উঠেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনেশ দাস চিন্তাভাবনায় অনেক বেশি ঋজু ও প্রখর হয়ে উঠেছেন। সময়ের সঙ্গে কবিতাকে করতে চেয়েছেন বাস্তব সম্মত। মুক্তিরপথের নিশানা কবির কাছে হয়ে উঠেছে মসৃণ। বিংশ শতকের সত্তরের দশকের রক্তঝরা দিনের ছাপ রয়েছে তাঁর কবিতায়। তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী। ঘটনার বহিঃপ্রকাশে তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্টও জোরালো। তাই সত্তরের দশকের সন্ত্রাসের ইতিহাস দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থের 'আইন ১৯৭৫', 'কিছু না', 'ভুতুড়ে দেশ' ইত্যাদি কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। উত্তাল দিনগুলোর ছবি তাঁর কবিতার প্রকৃত সময়কে তুলে ধরেছে—

'ভারী বুট পরে কারা চলে গেল সহসা হঠাৎ
দমকা ঝড়ে মুখে তরুণ পাখির আর্তনাদ
ঝড়ের আমারে মতো ঝরে এলোমেলো
ভারী ভারী বুট পরে কারা আজ রাজপথে এলো।''
('কিছু না'/ 'রাম গেছে বনবাসে')

১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার ঘোষণায় দিনেশ দাসের মনে ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা একেবারে চলে যায়। মনের এই যন্ত্রণা তিনি 'আইন ১৯৭৫'' কবিতায় স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।—

''লিলিপুটদের আইনের সুতো
আমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে
অথচ স্বাধীনতার পর
আমি কখনও আইন ভাঙিনি
আইনই আমাকে প্রত্যহ ভাঙছে।''

দিনেশ দাস যখন কাব্যজীবন শুরু করেন তিনি ছিলেন গান্ধীবাদী। পরবর্তীকালে কিছু ঘটনা ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মার্ক্সবাদী হয়েছিলেন। কখনো কখনো তিনি এই দর্শনেও সংশয়ী হয়েছিলেন বটে তবু তাঁর কবিতায় তিনি পীড়িত ও ক্ষুধার্তদের জয়গান

গেয়েছেন। বিশ্বাস হারালেও নিজেই আবার বিশ্বাস অর্জন করেছেন। হতাশাকে দূরে সরিয়ে সকলের পক্ষে তিনি আশা জাগরণের পথ দেখিয়েছেন—

''দিনের আলোয় রাজপথে কুবেরের গাড়িগুলি
আমার চোখে মুখে ধুলো ছোড়ে।
কখনো বা সর্বাঙ্গে কাদা ছিটোয়
আমার জীর্ন পরিধেয়
কল্যাণ রাষ্ট্রের লজ্জা অপমান
হয়তো আমিই একটা সোচ্চার প্রতিবাদ
একটি জীবন্ত স্লোগান।'' ('রাত্রিদেবতা'/ 'রাম গেছে বনবাসে')

'রাম গেছে বনবাসে' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশের পরও দিনেশ দাশ লিখেছেন বেশ কিছু কবিতা। দেশে প্রকাশিত 'নোটবুক' কবিতাটি জনগণের মনে প্রচণ্ড আলোড়ন তোলে। সত্তর বছর বয়সে ও তিনি ছিলেন তরুণ। তিনি তখনও বিশ্বাস করতেন স্রষ্টা শিল্পীরাই এ যুগের শ্রেষ্ঠ জাদুকর। তাঁরই নিয়ত অজানাকে জানার সীমায়, অচেনাকে চেনার সীমায় নিয়ে এসে আমাদের অবাক করে দেন— প্রসারিত করেন আমাদের চেতনার দিগন্ত। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কবি তিনবার শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ঐ কেবিনেই তিনি বিখ্যাত কবিতা 'নোটবুক', 'হাট' অ্যাটাক', 'সত্য শুধু সত্য' রচনা করেন। বাড়ি ফিরে তাঁর কলম কিন্তু থেমে যায়নি। ১৯৮৫ সালের ১৩ই মাচ' সকাল ৬-২০ মিনিটে মানবতাবাদী সংবেদনশীল জনগণের কবির প্রয়াণ ঘটে।

দিনেশ দাস পঞ্চাশ বছর কবিতা লেখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন সার্থক কবি। ধ্বস্ত সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে জীর্ন দীর্ণ হয়েও স্বপ্ন দেখতে ভোলেন নি। তিনি জানতেন - ''কেতবি হওয়া মানে চিরজীবন দারিদ্র্য বরণ করে নেওয়া - এ এক আত্মার যন্ত্রণা, এ এক আত্মার পীড়া।'' তবু কোনো প্রলোভনই তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। তাঁর বিশ্বাসকে ছোট হতে দেননি কখনো। তাঁর কাব্য প্রতিভা প্রগতিশীল বাংলা সাহিত্যে অপরিসীম। প্রত্যক্ষ জীবন ভাবনাকে কবিতার বিষয়বস্তু করেছেন। বঞ্চিত মানুষের সুখ দুঃখের সংগ্রামের কঠিন ভাবনাকে প্রসারিত করেছেন শিল্পীর নিপুণ দক্ষতায়। এরকম কাব্যের প্রসাদগুণ ও জীবন ঘনিষ্ঠতার মেলবন্ধন সত্যিই বিরল। যা দিনেশ দাসকে প্রগতিশীল কবিদের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয় করে রেখেছে। তিনি স্বপ্ন যেমন নিজে দেখেছেন তেমনি আশা জাগিয়েছেন আমাদের মত প্রগতিশীল পাঠকদের মনেও—

''এ মাটির চারা আমি, জানি আমি নিজে
এ গহন অরণ্যেও পথ আছে
দুধের ধারার মত সরু মেঠো পথ, আশার শপথ।''